অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশের বিবিধ সংকট মোচনে রবীন্দ্রনাথ : উপসংহার বা ফলপরিণাম।

অষ্টম অধ্যায়

স্বদেশের বিবিধ সংকট মোচনে রবীন্দ্রনাথ : উপসংহার বা ফলপরিণাম

॥ ১ ॥

দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য রবীন্দ্রচর্চা এখন অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের কাঙ্খিত ছিল স্বাধীনতার ভিতর স্বাধীনতা, পড়ে পাওয়া তথাকথিত স্বাধীনতা নয়। তিনি আত্মশক্তির জাগরণ, আত্মিক স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন বারংবার। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিও তাঁর দূরদৃষ্টিতে অগোচর ছিল না। নানা রচনায় সে প্রমাণ মেলে।

মানুষের 'আত্মশক্তির উদ্‌বোধনে'ই বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের। সেকারণেই কালান্তরের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—"তখন [স্বদেশী আন্দোলনের কালে] বারে বারে আমি কেবল একটি কথা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি যে মানুষকে অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে।...তখন বঙ্গবিভাগের ছুরি-শানানোর শব্দে সমস্ত বাংলাদেশ উতলা। মনের ক্ষোভে বাঙালি সেদিন ম্যাঞ্চেস্টরের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল।...এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ইংরেজ, ভারতবাসী উপলক্ষ, এর মুখ্য উত্তেজনা দেশের লোকের প্রতি প্রেম নয়, বিদেশী লোকের প্রতি ক্রোধ। সেদিন দেশের লোককে এই বলে সাবধান করবার দরকার ছিল যে, ভারতে ইংরেজ যে আছে এটা বাইরের ঘটনা, দেশ যে আছে এটাই আমাদের ভিতরের কথা। এই ভিতরের কথাটাই হচ্ছে চিরসত্য, আর বাইরের ব্যাপারটা মায়া।....ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী ; আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।...কিন্তু যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে আমি বাঙালিকে ডেকে এই কথা বলেছিলেম যে, আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।...দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি তখনি আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই।....

"...দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। দেশের যে-কোনো উন্নতি সাধনের জন্যে যে উপলক্ষ্যে আমরা ইংরেজ-রাজসরকারের দ্বারস্থ হয়েছি সেই উপলক্ষ্যেই আমাদের নৈষ্কর্ম্যকে নিবিড়তর করে তুলেছি মাত্র।...."[১]

রবীন্দ্রনাথের কথা আজ বাস্তবে মিলিয়ে দেখার সময় হয়েছে। স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা কিন্তু আজও চারিদিকে নানা সমস্যার পাহাড়। তাঁর ভারত ভাবনায় আগামী ভারতবর্ষের ছবি নিশ্চয়ই এমন ছিল না।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর (১৯৮০) প্রতি খণ্ডেরই 'নিবেদন' অংশের দুটি অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—"....কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।...

"মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।"

এই সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথকে মধ্যমণি করে স্বদেশী আন্দোলন ও তাঁর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা অবলম্বনে অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলাম। বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনকালে স্বদেশী ভাবনায় উদ্বেলিত রবীন্দ্রনাথের কবি-কর্মীর ভূমিকার দীর্ঘ পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'ভাণ্ডার' পত্রিকাকে অবলম্বন করে তাঁর কার্যকলাপও পর্যালোচিত হয়েছে। এবারে এই শেষ অধ্যায়ে তার অন্তর্নিহিত মূল্যমানটির কথা সংক্ষেপে বলে প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই।

॥ ২ ॥

পূর্বের সাতটি অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনায় ও অনুসন্ধানে যে বিষয়টি আমরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি, তা হল স্বদেশী আন্দোলনের কালে (১৯০৫-১৯১১) 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে স্বদেশ সম্পর্কিত রবীন্দ্রভাবনা ও কর্মপরিকল্পনা কতদূর প্রসারিত ছিল এবং সমকালে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও কত স্বতন্ত্র ছিল। বিভিন্ন আলোচনা বক্তৃতা কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণে কবির ভিন্ন মাত্রার স্বদেশপ্রেম বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বিদ্যুৎ আলোকের মতো

উদ্ভাসিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁর এই স্বদেশী-কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতর সুদূরপ্রসারী মূল্য রয়েছে অন্যখানে। সবশেষে সংক্ষেপে সে বিষয়টি স্পষ্ট করে বর্তমান অনুসন্ধানের পর্ব সমাপ্তি হবে।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি, তা হল স্বদেশ ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মূল কথাটাই ছিল আত্মনির্ভরতা বা আত্মিক স্বাধীনতা। সে পল্লীমঙ্গলের ক্ষেত্রেই হোক বা শিক্ষা সংস্কারেই হোক--সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করে নেওয়া। তাঁর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ছিল, 'দেশ' বলতে মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত নাগরিক মানুষ নয়, তিনি বুঝতেন 'গ্রামে গাঁথা' বংলাদেশকেই। তাই স্বদেশের উন্নয়ন বলতে তিনি বুঝেছেন পল্লীগ্রামের উন্নতি। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আপামর বাঙালীর সম্মিলিত সংগঠন--সে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এক সমবায়িক সৃষ্টি পদ্ধতিতে। লিখেছেন--"একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত দেশের যোগবন্ধন।"[২] শিক্ষা-সংস্কৃতি ধর্ম-কর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতেই ছিল সঞ্চারিত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সমাজের এই অখণ্ড রূপ খণ্ডিত হয়েছে য়ুরোপ থেকে আসা 'ভেদশক্তি'র কারণে। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'চিরদুঃখের অন্ধকারে' তলিয়ে গেছে আমাদের পল্লীগ্রাম। জীবনচর্যার সর্বক্ষেত্রেই এই বিনষ্টির মোচনে কর্মী রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টার সে ছবি আমরা যথাস্থানে উপস্থাপিত করেছি।

প্রবল পাশ্চাত্ত্য অভিঘাতে নগরকেন্দ্রিক আভিজাত্যগর্বী মুষ্টিমেয় মানুষের ইংরেজিয়ানা থেকে মাতৃভাষাকে যথা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দেশীয় অন্তঃস্বভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাঁর স্বতন্ত্র ভূমিকা বাঙালীর ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার দাবী রাখে। স্বদেশী আন্দোলনকালে পাশ্চাত্ত্য অনুপ্রাণিত 'পেট্রিয়টিক' মনোভাবনা কিংবা 'নেশন' চেতনা অন্যান্য দেশনেতাদের মধ্যে প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যত্র। ভারত ইতিহাসের ধারায় তিনি দেখেছেন এদেশে 'নেশন' নয়, 'সমাজ'ই প্রবল। তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' ভাবনার উদ্ভব এইখান থেকেই। বাংলাদেশের সার্বিক জীবনচর্যার বহমান প্রেরণাকে যুগোপযোগী রূপ দেওয়ার বাসনা ছিল তাঁর কাছে এক ধরনের 'প্যাশন'। স্বদেশীযুগের অব্যবহিতপূর্ব থেকেই ভাবের ও কর্মের জগৎকে একই খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই কবি-কর্মীর ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছিল ওই স্বদেশী আন্দোলনকালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায়। দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক ;— প্রথমটির ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গের সময়ে কবির লেখা স্বদেশী গানগুলি (বেশির ভাগই 'ভাণ্ডার'-এ প্রকাশিত) বৃহত্তর বাঙালীর মনে উন্মাদনার যে জোয়ার এনেছিল এমনটি ইতিহাসে বিরল। তরুণদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী-সংগীত শেখার ব্যাকুলতা এতই তীব্র হয়েছিল যে এই ধরনের গান শেখা এবং শেখানোর জন্য ডন্ সোসাইটিতে 'Music Class' খুলতে হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে।[৩] জনগণের কাছে

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তখন চারণকবির। তাঁর ভাবজগতের সৃষ্ট গানগুলি বাঙলাদেশের মানুষকে একটি জাতিতে পরিণত করেছিল। আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে আত্মশক্তির বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল অন্যতম সহায়ক।

'আত্মপরিচয়' দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন কবির কাজ কি?—কবির কাজ বহু মানুষের "চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্‌বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন-সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।"[৪] কবি রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাই স্বদেশী আন্দোলনকালে সমগ্র বাঙালী জাতিকে এক ভাবের দোলায় উদ্বোধিত করেছিল, দিশা দেখিয়েছিল মুক্তিপথের। 'আত্মপরিচয়'-এ তাঁর বিনীত নিবেদন ছিল—মানুষের "চিত্তকে আনন্দে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হতে পারব না। শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে, যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নিচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার ওস্তাদ আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি-ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"[৫] গানের মধ্য দিয়েই মানুষের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন তিনি কবির ভূমিকাতেই। দ্বিতীয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনও করেছিলেন ; তা হল জোট বাঁধার কৃতার্থতায় মানুষে মানুষে মিলনের পথটিকে প্রশস্ত করা। অন্য প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষ মনে মনে "মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।" এই মিলনের মন্ত্রই ছিল তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে—'একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'। এই মিলন ও সংযোগের আহ্বানগীত কেবল বঙ্গভঙ্গ রোধের কারণেই নয়, সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিভেদ-বিচ্ছেদ, এমনকি সকল স্তরে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগীত—

এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা
হাতে হাতে ধর গো।

*　　*　　*

সামনে মিলন-স্বর্গ।

বঙ্গভঙ্গের কালে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ভূমিকাটি ছিল অক্লান্ত কর্মীর। স্বদেশীসমাজের সংবিধান প্রণয়নে, গ্রাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনায়, শিক্ষার সার্বিক সংস্কার ও মুক্তির বিকাশে দেশের মানুষের দারিদ্র্য মোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, এমনকি হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টায়—দেশ ও জাতিগঠনের এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পুরোহিতরূপে তাঁর কর্মচঞ্চল রূপটি ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। শুধু পরিকল্পনা নয়, সেই পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করেছিলেন আপন সীমিত ক্ষমতায়,—সে পল্লীসংস্কার বা শিক্ষা সংস্কার যাই হোক না কেন। নানা বাধা বিপত্তিতে অকৃতকার্য হয়েছেন—কিন্তু আদর্শের

প্রতি বিশ্বাস রেখে চেষ্টা করে গেছেন বারংবার, আমৃত্যু। যথাস্থানে এসব প্রসঙ্গ তথ্য প্রমাণসহ বিবৃত করেছি। বস্তুত 'কবি-কর্মীর' এই দ্বিমাত্রিক ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। রবীন্দ্র প্রতিভার সেই অনন্যতুল্য স্বরূপটির অনুসন্ধানেই এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান আগ্রহ নিবদ্ধ ছিল।

॥ ৩ ॥

এবারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছেন 'গ্রামেই আমাদের দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ছিল'।[৬] আধুনিক যুগে এ আসলে রবীন্দ্রনাথেরই প্রথম আবিষ্কার। তাঁর আগে এত গভীরভাবে সে কথা অন্য কেউ ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। বৃহত্তর বাঙালীর জীবন ধর্মকে খুঁজে ফেরার আগ্রহে তাঁর পল্লী প্রাণতায় কোন ভেজাল ছিল না। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির আত্ম আবিষ্কারের যে পথ তিনি নির্দেশ করেছিলেন, বর্তমান কালে নানাবিধ সমস্যা পীড়িত জাতির কাছে, দেশ গঠনের 'মডেল' কি তা হতে পারে না? এ প্রশ্ন সততই মনে জাগে।

রবীন্দ্রনাথের কাল থেকে অনেকটা পথ এগিয়ে এলেও সার্বিক বিরোধ ও বিভেদ-বিচ্ছেদ-বিচ্ছিন্নতার সংকটে দেশের অবস্থা আজ ত্রিশঙ্কু। অথচ মিলনসূচক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে বৃহত্তর মানব সমাজের প্রাণিক সংযোগ সাধনেই তা দূর হওয়া সম্ভব। 'ভাণ্ডার' পত্রিকার মাধ্যমে এইসব আলোচনা ও মত বিনিময়ের পথটিই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ।

আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে আত্মশক্তির জাগরণ যে সম্ভব, 'ভাণ্ডারে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকেই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ণ উদ্যমে যোগ দেন নি—এই ঐতিহাসিক সত্যের কারণ অনুসন্ধানে 'ভাণ্ডারে'র 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনার অবকাশ করে দিয়েছিলেন সম্পাদক। সমস্যা মোচনের পথনির্দেশও বেরিয়ে এসেছিল সেইসব আলোচনায়। যার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তব দৃষ্টান্তসহ জাতিভেদ প্রথার কুফল, বৃহত্তর বাঙালী জাতির একতার দিকে লক্ষ্য রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা, সমাজের সুষ্ঠ পরিচালনায় সমবায় ও পঞ্চায়েত প্রথার যৌক্তিকতা, পল্লী বাংলার মানুষের কাছে সহজভাবে বিজ্ঞানের প্রচার. শিল্প বাণিজ্যে দেশের মানুষকে উৎসাহদান ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় নিয়ে মুক্তবুদ্ধি বহু মানুষ আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ভাণ্ডারের প্রস্তাব ও প্রশ্ন-উত্তর বিভাগে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনকল্যাণমূলক ব্যাপক কর্মোদ্যম। দেশের শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতিবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে সেখানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশীচন্দ্র নাথের একটি প্রগতিশীল বক্তব্য 'ভাণ্ডারে'র পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করি। জোরের সঙ্গে তিনি

লিখেছেন—"তবে শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদেশ যাইতে হইবে, অন্য জাতির সহিত মিশিতে হইবে, এরূপ মিশামিশির জন্য কাহাকেও সমাজচ্যুত করা সঙ্গত মনে করি না।....একজন ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ চামড়া tan করিবেন, কিন্তু কেহ জুতা বা ছাতির দোকান করিলে কেন জাতিচ্যুত হইবেন। এরূপ জাতীয়তা আমরা প্রার্থনা করি না। বঙ্গীয়, রাঢ়ীয় ইত্যাদি প্রকারের ভেদ জ্ঞানও আমি শুভজনক মনে করি না।...জাতিভেদপ্রথা রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায় নয়। তবে রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষিত ও উন্নত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণ লোকে রাজনৈতিকতার ততটা ধার ধারে না।...জাতিভেদ প্রথা একতার প্রতিবন্ধক এবং একতা রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলমন্ত্র।"[৭]

দেখলে আশ্চর্য হতে হয় এই 'একতা' রক্ষার্থে ভাণ্ডারে কত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই না সেকালে হয়েছিল। মক্তব-মাদ্রাসার দ্বারা শিক্ষামাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিভেদটি স্বাধীনতার এতকাল পরেও জেগে আছে। অথচ সমস্যাটির সমাধানকল্পে কত আগেই না ভাণ্ডারের পৃষ্ঠায় আলোচনা হয়েছিল। 'ভাষার একত্বে' এবং সাহিত্যের চর্চায় তা দূরীভূত হতে পারে। মুসলমান মহাপুরুষদের জীবনী বেশি করে রচনার প্রয়োজন সেকালেই অনুভব করেছেন ভাণ্ডারের লেখকেরা। এবিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে যেমন দৃষ্টি দেওয়া দরকার তেমনি মুসলমান লেখকদের সচেষ্ট হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। একে অপরের উৎসবে যোগদান বা এক পাড়ায় উভয় সম্প্রদায়ের বসবাস—ভাণ্ডারে উপস্থাপিত এই সব প্রস্তাব আজও বাস্তবে রূপায়ণ হয় নি—এটাই আক্ষেপের!

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কিভাবে মেলা যাত্রা কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে লোকশিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ সম্ভব। এইভাবে বহুবিধ কর্মের মধ্য দিয়েই স্বদেশের আত্ম আবিষ্কারের পথ দেখিয়েছিলেন তিনি। আজও যার প্রয়োজন ফুরোয় নি তো বটেই বরং বেশি করে গ্রহণ করার সময় এসেছে। এক সর্বায়ত বাঙালী মানসিকতা সৃষ্টির এই রবীন্দ্র-উদ্যোগ অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণার ফল পরিণাম।

পুনরায় বলি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও কর্মপরিকল্পনা আসলে এক অখণ্ড বাঙালী চেতনা সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রয়াস। যথার্থ মর্যাদাসহ এই প্রয়াস-প্রচেষ্টা সমাজ ও দেশগঠনে গৃহীত হোক—এই আশা নিয়ে আমাদের অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটাই।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য

১. 'সত্যের আহ্বান', কালান্তর, দ্র. র. র. (প. ব.), ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ ৬৩৭-৩৮।

২. দ্র. পল্লীসেবা, র. র. (শতবর্ষ সং), ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫১৭।

৩. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড. ১৯৯০, পৃঃ ২৫৯।

৪. দ্র. আত্মপরিচয়, র. র. (শতবর্ষ সং), ১৩৬৮, দশম খণ্ড, পৃঃ ২১৫।

৫. দ্র. আত্মপরিচয়, র. র. (প. ব.), একাদশখণ্ড, ১৯৮৯, পৃঃ ১৫৬।

৬. দ্র. 'গ্রামবাসীদের প্রতি', পল্লীপ্রকৃতি, র. র. (শতবর্ষ সং), ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৫২৩।

৭. দ্র. ভাণ্ডার. কার্তিক ১৩১৩, পৃঃ ২৫৩-৬১।